بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে পাঠিয়ে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার ধারা সূচীত করেছেন। তারা নিশ্চয় খুবই সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন যারা ১৪০০ বছর পর পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার নিত্য-নতুন এবং তাজা ওহী নাযিল হওয়ার যুগ পেয়েছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এটি থেকে সরাসরি আশিসমন্ডিত হয়েছেন। সাহাবীগণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চতুষ্পার্শ্বে নিজেদের পেয়ে এই মহা সৌভাগ্যের জন্য কীভাবে খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করতেন, মানুষ যদি কল্পনার দৃষ্টিতে এর প্রতি তাকায় তাহলে তার অন্তরাত্মায় এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করে। খোদা তা'লা বলেছেন, আমি আখারীনদের মাঝে অর্থাৎ শেষ যুগেও এমন লোক সৃষ্টি করব যারা পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হবে। মহানবী (সা.)-এর দাসের মাধ্যমে ওহী এবং ইলহামের সতেজ এবং নিত্য-নতুন নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতকারীদের ঈমানকে তিনি দৃঢ়তর করেছেন, স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে খোদা কতই না সত্যবাদী। তাদের প্রতিটি প্রভাত হতো এই সন্ধানে যে, আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি নতুন কি ওহী এবং ইলহাম হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সাহাবীদের এই অবস্থার উল্লেখ এভাবে করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওহী সংক্রান্ত অবস্থা এমন ছিল যে, আহমদীরা সূর্য উদিত হতেই প্রেমিকের মতো এদিক সেদিক এটি জানার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করতেন যে, রাতে হুযূরের প্রতি কি ওহী-ইলহাম হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ঘর থেকে বের হতেই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন বা অন্য কোন বালক বের হলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, আজ নতুন কী ওহী বা ইলহাম হয়েছে তাঁর প্রতি? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার নিজের অবস্থার চিত্র হলো, এদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযের জন্য যেতেন আর আমি ছুটে গিয়ে খাতা বা রেজিস্টার খুলে দেখতাম, নতুন কি ইলহাম হয়েছে বা নিজেই মসজিদে পৌঁছে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুনতাম।

অতএব সাহাবীদের মাঝে এরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ ছিলো নিজেদের ঈমানকে আরো সতেজ করা, এর কল্যাণ লাভ আর খোদার কৃতজ্ঞতা এবং গুণকীর্তন করা, কেননা তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন। অনেক সময় কোন সাহাবীর উপস্থিতিতেও ইলহাম হতো আর সেই সৌভাগ্যাবানও খোদার ওহীকে একই সাথে শুনতেন। অনেক সময় এই অবস্থাও হতো যে, সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিও ইলহাম শুনতেন। যার উপস্থিতিতে ইলহাম হয়েছে এমনই এক পুণ্যবান ব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ডক্টর সৈয়্যদ এনায়েতুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এক প্রবীন

আহমদী পরিবারের সদস্য। তার পিতা সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতি সম্মানিত একজন সাহাবী ছিলেন। সচরাচর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেবা করতেন। তিনি প্রায়শঃ কাদিয়ান যাতায়াত করতেন। সৈয়্যদ নাসের শাহ্ সাহেব ওভারসিয়ার যিনি পরে সম্ভবত এসডিও পদেও উন্নীত হয়েছিলেন, তার ভাই ছিলেন এই সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব। তার মাঝেও বড় নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছিল। তিনিও তার আন্তরিকতার কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে অতিপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিষ্ঠার কারণে তার ভাইকে বলতেন অর্থাৎ সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেবকে বলতেন, কোন কাজের প্রয়োজন নেই, কাদিয়ান গিয়ে বসে থাকো। হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করো, আমাকে কিছু ডাইরি পাঠিয়ে দিও আর দোয়ার অনুরোধ করতে থাকবে। তোমার ব্যয়ভার আমি বহন করবো। তিনি তার ভাইয়ের সাহায্যে শুধু এই জন্য লেগে থাকতেন যে, তিনি কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ওহী যার শুরুতে রয়েছে **'আর্ রাহা'**, যা প্রায় এক রুকুর সমান হবে। এটি এমন অবস্থায় নাযিল হয়েছে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিডনি (বৃক্ক) রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব তখন তাঁর পা টিপছিলেন অর্থাৎ তার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব হলো, তার পা টিপা অবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ওহী হয়েছে আর এই ওহীও এমন পর্যায়ের ছিলো যে, অনেক সময় ওহীর শব্দ উচ্চস্বরে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে আমরা ছোট বালক ছিলাম আর অসাবধানতা বশতঃ সেই কক্ষে প্রবেশ করি যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শায়িত ছিলেন। তিনি নিজেকে চাদরে আবৃত করে রেখেছিলেন। সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব মরহুম তাঁর পা টিপছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন, ওহী নাযিল হচ্ছে। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই লিখেছেন, একই সাথে তিনি ওহী লেখাচ্ছিলেনও। হযরত ফযল শাহ্ সাহেব ইঙ্গিতে আমাকে বলেন, এখান থেকে চলে যাও। আমরা বের হয়ে আসি। পরে জানা যায়, একটি দীর্ঘ ওহী তাঁর (আ.) প্রতি নাযিল হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে ইলহামের কথা বলছেন এটি সেই ঘটনা এবং মামলা সংক্রান্ত যখন মির্যা ইমাম দ্বীনরা দেয়াল উঠিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। আদালতে যেসব কাগজ বা দলিলপত্র উপস্থাপিত হয়েছে এর নিরিখে সিদ্ধান্ত বিরোধীদের অনুকুলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল বরং তারা এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, অচিরেই মামলা খারিজ হয়ে যাবে কিন্তু যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) সংবাদ দিয়েছিলেন ঠিক তদ্রুপই হয়েছে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে এমন একটি প্রমাণ দলিলপত্র হতে বেরিয়ে আসে যাতে মির্যা ইমাম দ্বীনের সাথে হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতাও দখল সত্ত্বে সেই ভূমির অংশীদার ছিলেন তা সুস্পষ্ট হয়। আদালত তাঁর পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয় এবং দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়। এই ওহীতে অসাধারণ মহিমা অন্তঃর্নিহিত আছে তাই আমি এর অনুবাদ পড়ছি, তাযকেরা এবং হকীকাতুল ওহীতে এর উল্লেখ রয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আমার মনে আছে কাশ্মীরের বারোমালায় নিযুক্ত ওভারসিয়ার সৈয়্যদ নাসের শাহ্ সাহেবের ভাই সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব লাহোরী তখন আমার পা টিপছিলেন আর সময় ছিল দুপুর বেলা। দেয়ালের মামলা সংক্রান্ত ইলহাম নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। আমি সৈয়্যদ সাহেবকে বললাম, এগুলো দেয়ালের মামলা সংক্রান্ত ইলহাম। এই ইলহামের ক্রমাগত নাযিলের ধারায় আপনি লিখতে থাকুন। তিনি কলম, দোয়াত এবং কাগজ নিয়ে আসেন। যা ঘটেছে তাহলো, প্রতিবার তন্দ্রাভাব এসে আল্লাহ্‌র ওহীর একটি বাক্য তাঁর রীতি অনুসারে মুখ থেকে নিঃসৃত হতো। একটি বাক্য সম্পূর্ণ হওয়া এবং লিপিবদ্ধ হওয়ার পর আবার তন্দ্রাভাব হতো এবং এরপর আল্লাহ্‌র ওহীর দ্বিতীয় বাক্য মুখ থেকে নিঃসৃত হতো। এক পর্যায়ে পুরো ওহী নাযিল হয়ে তা সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেবের কলমে লিপিবদ্ধ হয়। আর বোঝা গেছে যে, তা সেই দেয়াল সম্পর্কে যা ইমাম দ্বীন দাঁড় করিয়েছে এবং যার মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল আর উপলব্ধি হয়েছে যে, অবশেষে এই মামলায় বিজয় লাভ হবে। আমি আমার জামাতের একটি বিশাল শ্রেণীকে আল্লাহ্ তা'লার এই ওহী শুনিয়েছি। আর এর অর্থ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত করেছি এবং আল্ হাকাম পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছি। সবাইকে অবহিত করেছি, যদিও মামলা ভয়াবহ ছিল এবং পরিস্থিতি নৈরাশ্যকর মোড় নিচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যারফলে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে। ঐশী ওহীর বিষয়ের সারবস্তু এটিই ছিল।"**

এই ওহী আরবীতে হয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ ওহী, এর অনুবাদ পড়ছি। অনুবাদ হলো, **"চাক্কি ঘুরবে আর ঐশী তক্বদীর নাযিল হবে অর্থাৎ মামলার পরিস্থিতি বদলে যাবে, যেভাবে চাক্কি যখন ঘুরে তখন চাক্কির যে অংশ সামনে থাকে তা ঘুর্ণনের কারণে চোখের আড়ালে চলে যায় আর যে অংশ চোখের আড়ালে থাকে তা সামনে এসে যায়। এটি খোদার কৃপা যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।"** স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই অনুবাদ করেছেন। **"যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, কেউ তা রদ করতে পারবে না। তুমি বল, আমার খোদার কসম! এ কথাই সত্য। এতে কোন পরিবর্তন আসবে না আর এ বিষয়টি প্রচ্ছন্নও থাকবে না। আর একটি কথা সামনে আসবে যা তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করবে। এটি সেই খোদা তা'লার ওহী যিনি সুউচ্চ আকাশের প্রভু। আমার প্রভু সেই সিরাতে মুস্তাকিম বা সরল-সোজা পথ পরিত্যাগ করেন না যা তাঁর মনোনীত বান্দাদের বেলায় তাঁর রীতি। তিনি তাঁর সেই বান্দাদের ভুলেন না যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। এই মামলায় তুমি প্রকাশ্য বিজয় লাভ করবে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ততক্ষণ বিলম্বিত হবে যতক্ষণ আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তুমি আমার সাথে রয়েছ আর আমি তোমার সাথে। তুমি বল! সকল বিষয় আমার আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। এরপর এই বিরোধীকে তার ভ্রষ্টতা, অহংকার আর গর্বের মাঝে ছেড়ে দাও। সেই সর্বশক্তিমান খোদা তোমার সাথে আছেন। তিনি গুপ্ত বিষয়াদি জানেন বরং যা অতি প্রচ্ছন্ন, যা মানুষের বোধ-বুদ্ধিরও ঊর্ধ্বে, তিনি তাও জানেন। সেই সর্বশক্তিমান খোদাই সত্যিকার উপাস্য, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। মানুষের কারো ওপর এমনভাবে নির্ভর করা উচিত নয় যেন সে তার**

খোদা। একমাত্র খোদা তা'লাই এই বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখেন। তিনি এমন সত্তা যিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, যিনি সবকিছু দেখছেন। আর সেই খোদা তাদের সাথে থাকেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর তাঁকে ভয় করে আর যখন কোন সৎকাজ করে তখন পুণ্যের সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুষঙ্গগুলো অনুসরণ কওে, কেবল ভাসা ভাসা সৎকর্ম করে না আর ত্রুটিপূর্ণভাবেও নয় বরং এর গভীরতম দিকগুলো অনুসরণ করে এবং খুব সুন্দরভাবে তা সমাধা করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা তাঁর পছন্দনীয় পথের সেবক, তারা সে পথের পথিক এবং অন্যদেরকেও সেপথে পরিচালিত করে। আমরা আহমদকে, হুযূর (আ.) বলছেন, অর্থাৎ এই অধমকে তার জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি। জাতি তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেছে, তারা বলে, এ মিথ্যাবাদী, জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন অর্থাৎ এমন ধূর্ততার মাধ্যমে জাগতিক আয়-উপার্জন করতে চায়, তারা তাকে গ্রেফতার করানোর জন্য আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিয়েছে আর এক প্রবল বন্যা যা ওপর থেকে নিচের দিকে ধেয়ে আসে সেভাবে তার ওপর আক্রমন করছে কিন্তু তিনি বলেন, আমার প্রিয় আমার অতি নিকটে। সে অবশ্যই আমার নিকটে কিন্তু বিরোধীদের দৃষ্টির অন্তরালে।"

অতএব বড় মহিমার সাথে এই ওহী পূর্ণ হয়েছে। বেশ কয়েক স্থানে তিনি এটি উল্লেখ করেছেন। হয়তো একাধিক বারও হয়ে থাকবে। অবশেষে গুপ্ত বিষয় প্রকাশ পেয়েছে আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। যখনই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে সব বিরোধীর অলীক বাসনা তাদেরই বিরুদ্ধে বর্তেছে এবং তাদের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, আমাদের কানে এখনো সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যা সরাসরি আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি। তিনি (রা.) বলেন, আমি ছোট ছিলাম। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠক বা মজলিসে বসে থাকা এবং তাঁর কথা শোনাই ছিল আমার রীতি বা অভ্যাস। তিনি বলেন, আমরা এসব বৈঠকে এত মাসলা-মাসায়েল শুনেছি যে, তাঁর রচনাবলী যখন পঠিত হয় তখন এমন মনে হতো যেন সব কথা আমরা পূর্বেই শুনেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল, দিনের বেলা যা কিছু লিখতেন সন্ধ্যাবেলা মজলিসে বা বৈঠকে এসে তা শোনাতেন। তাই তাঁর সব কথা আমাদের মুখস্থ আছে আর এর অর্থ আমরা খুব ভালোভাবে বুঝি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা ও তাঁর শিক্ষা-সম্মত।

সত্যিকার ঈমানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেন, একজন মাকে সন্তানের সেবার জন্য যদি শুধু যুক্তি প্রমাণ-প্রমাণ দিয়ে বোঝানো হয় আর বলা হয়, যদি সেবা না কর তাহলে ঘরের ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে যাবে, এই হবে, সেই হবে; এসব যুক্তি-প্রমাণ এক মুহূর্তেও তরেও তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে একজন মা'কে তার সন্তানের সেবায় বাধ্য করা যায় না। তিনি সেবা করলে সেই ভালোবাসার চেতনা এবং প্রেরণার অধীনেই করেন যা তার হৃদয়ে সহজাতভাবে বিরাজমান থাকে। এ কারণেই

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, **'ঈমানুল আজায়েয'** অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলার যেমন ঈমান হয়ে থাকে সে ধরনের ঈমানই মানুষকে হোঁচট থেকে রক্ষা করে নতুবা যারা বিভিন্ন অজুহাত এবং বাহানা খুঁজে তারা প্রতিটি পদক্ষেপে কাজ বন্ধ করে দেয় এবং বলে, অমুক নির্দেশ কেন দেয়া হলো, অমুক কাজ করতে কেন বলা হলো? এ ধরনের মানুষ প্রায়শঃ হোঁচট খায় এবং তাদের অল্প-স্বল্প ঈমান যা থাকে তাও লোপ পায়। কিন্তু পূর্ণ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি নিজের ঈমানের ভিত্তি রাখে পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ওপর। সে অন্যের যুক্তি প্রমাণ শুনলেও তাদের আপত্তির প্রভাব গ্রহণ করে না কেননা; এমন ব্যক্তি খোদা তা'লাকে স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা রাখে। এরপর তিনি মুন্সি আরোড় খান সাহেবের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তার একটি চুটকি আমার মনে আছে। হুযূর বলছেন, পূর্বেও দু'একবার আমি হয়তো এটি শুনিয়েছি, পুনরায় বলছি। তিনি বলেন, মুন্সি আরোড়া খান সাহেব বলতেন, কিছু মানুষ আমাকে বলে, তুমি যদি একবার সানাউল্লাহ্ সাহেবের বক্তৃতা শোন তাহলে বুঝতে পারবে, মির্যা সাহেব সত্য কি মিথ্যা। তিনি বলেন, একবার আমি মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবের বক্তৃতা শুনি। এরপর মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করে, এত যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও কি মির্যা সাহেবকে সত্য ভাবা যেতে পারে? তিনি বলেন, আমি বলেছি, **আমি মির্যা সাহেবের চেহারা দেখেছি। তাঁর চেহারা দেখার পর যদি মৌলভী সানাউল্লাহ্ দু'বছরও আমার সামনে বক্তৃতা করে তবুও তার বক্তৃতা আমার ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না কেননা; আমি বলতে পারি না যে, তা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা।** তার আপত্তির কোন উত্তর আমার মাথায় না আসলেও আমি একথাই বলবো যে, হযরত মির্যা সাহেব সত্য। বস্তুতঃ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান থাকা কামেল মু'মিনের জন্য আবশ্যক নয় কেননা তার ঈমান যুক্তির ভিত্তিতে নয় বরং পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে আর এভাবেই তিনি ঈমান এনে থাকেন।

মুন্সি আরোড় খান সাহেবেরই আরেকটি ঘটনা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি সামনে আনা আবশ্যক যে, আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে দেখার চেষ্টা করা উচিত আর এটি খোদার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার মাধ্যমেই সম্ভব। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় ঈমানও তখনই প্রকৃত ঈমান হবে যদি আমরা এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এযুগে জগদ্বাসীর সংশোধনের নিমিত্তে প্রেরণ করেছেন আর এটিই যুগের চাহিদা। যুগ দাবি করছিল, যুগ এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ। এছাড়া অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা এই বিভ্রান্ত এবং পথহারা যুগ সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সাথে যদি সম্পর্ক বন্ধন থাকে তাহলে কার্যনির্বাহক খোদার ভয়ও থাকে। তখন আর বহু নিদর্শন বা যুক্তি প্রমাণ দেখার প্রয়োজন হয় না বা মু'জিযা দাবি করার প্রয়োজন হয় না। যুগের চাহিদা এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর সত্যতার প্রমাণ।

তাই আমাদের সর্বদা এটি সামনে রাখা উচিত আর এর বরাতেই নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন যুগের প্রয়োজনের এই চেতনা যেন অন্যদের মাঝেও জাগ্রত হয় এবং তারাও যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করতে পারে।

মুন্সি আরোড়ে খান সাহেবের আন্তরিকতার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের জামাতে কিছু এমন নাম আছে যা শুনতে অদ্ভুত মনে হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবীর নাম ছিল আড়োরা খান। এই নামটিও অদ্ভুত মনে হয়। এই নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সে যুগের রীতি ছিল, এমন মানুষ যাদের সন্তান-সন্ততি সচরাচর মারা যেত তারা নিজ সন্তানকে আবর্জনার স্তুপের ওপর টানাহেঁচড়া করতো এই আশায় যে, হয়তো এভাবে তার প্রাণ রক্ষা পাবে। এটি একটি কু-প্রথা ছিল অথবা মনে করা হতো, এমনটি হবে। এরপর তার নাম রাখা হতো আরোড়া। মুন্সি সাহেবের নামও তার পিতা-মাতা এভাবেই রেখেছেন কিন্তু তিনি খোদার দৃষ্টিতে আরোড়া ছিলেন না বা আবর্জনার স্তুপে থাকার মানুষ ছিলেন না। পিতা-মাতা তার এই নাম এজন্য রেখেছিলেন যে, আবর্জনার স্তুপে থেকে হয়তো এই বাচ্চা জীবিত থাকবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চরণে এনে তাকে শুধু দৈহিক মৃত্যু থেকেই নয় বরং আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকেও রক্ষা করতে চেয়েছেন। পিতা-মাতা তাকে আবর্জনার হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন কিন্তু খোদা তা'লা তার পবিত্র হৃদয় দেখেছেন এবং তাকে গ্রহণ করেছেন এবং তা তাকে ঈমানে ধন্য করেছে এবং তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিষ্ঠাবান সাহাবীতে পরিণত হয়েছেন, এরূপ নিষ্ঠাবান যে, খুব কম মানুষই এমন হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমন আন্তরিকতা ছাড়া মুক্তির আশা রাখা দুরাশা মাত্র। তিনি এমন মুখলেস আর নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার প্রশংসা করছেন। তারা স্বীয় আন্তরিকতার প্রমাণ এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তারা ভালোবাসা এবং প্রেমের এক তাবু-স্বরূপ বা মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, মরহুম মুন্সি সাহেব হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে মামলার শুনানি বিভাগে কাজ করতেন। মাসে একবার তিনি অবশ্যই কাদিয়ান আসতেন। যেহেতু একদিনের ছুটি যথেষ্ট হতো না তাই যতক্ষণ না সপ্তাহের আরো কিছুদিন পেতেন, তাই যেদিন তার কাদিয়ান আসার পালা হতো সেদিন তার উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা অফিসের কর্মচারীদের বলে দিতেন, আজ তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হওয়া উচিত কেননা; মুন্সি সাহেব কাদিয়ান যাবেন। তিনি যদি কাদিয়ান যেতে না পারেন তাহলে তার হৃদয় থেকে এমন আহাজারি বা হা-হুতাশ নির্গত হবে যে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব। এইভাবে তাকে সবসময় যথাসময়ে কাজ থেকে ছুটি দেয়া হতো। সেই কর্মকর্তা যদিও হিন্দু ছিল কিন্তু মুন্সি সাহেবের পুণ্য, তাক্বওয়া এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার তার ওপর এমন প্রভাব ছিল যে, সে নিজেই তাঁর কাদিয়ান যাওয়ার সময় করে দিত এবং বলতো, তিনি কাদিয়ান যেতে না পারলে তার হৃদয় থেকে এমন হা-হুতাশ বা আহাজারি নির্গত হবে যে, আমার জন্য রক্ষা

পাওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই এসব পুণ্যবানের অ-আহমদীদের ওপরও প্রভাব ছিল যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র চেহারা দেখেছেন এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় অগ্রগামী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষ খোদার সাথে যেমন ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'লাও তেমনই ব্যবহার করেন। অতএব মানুষ যেভাবে তাঁর জন্য হৃদয়কে বিগলিত করে আল্লাহ্ তা'লাও সেভাবেই তার সাথে ব্যবহার করেন। পৃথিবীর মানুষ তাদের মারে, গালি দেয়, চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু সে প্রত্যেকবার অবদমিত হওয়ার পর বলের ন্যায় ওপরে লাফিয়ে ওঠে। এমন মু'মিনকে সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি উন্নতি দিয়ে থাকেন। এটিই প্রকৃত জামাত হয়ে থাকে যা উন্নতি করে। তাই নিজেদের মাঝে এমন ঈমান সৃষ্টি করা উচিত। অতএব নিজেদের হৃদয়কে এমনই বানাও আর জামাতের জন্য হৃদয়ে এমনই ভালোবাসা সৃষ্টি কর, তারপর দেখ! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তোমাদের উন্নতি দেন। যারা খোদার হয়ে যায় তাদের তো চাইতেও হয় না বা হাতও পাততে হয় না। অনেক সময় অভিমান করে বলেন, আমরা চাইব না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের অভাব মোচন করেন বা চাহিদা পূরণ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছেই আমি এই ঘটনা শুনেছি, একজন পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। একবার তিনি মারাত্মক সমস্যা কবলিত হন। কেউ তাকে বলে, আপনি দোয়া করেন না কেন। তিনি বলেন, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে দিতে না চান তাহলে আমার দোয়া করা তাঁর অবমাননা। তাঁর যেহেতু ইচ্ছা নেই তাই চাইব কেন। এই ছিল তার বিশেষ পদমর্যাদা। এমন পরিস্থিতিতে আমি এটিই চাইবো যে আমি যেন তা না পাই। আর তিনি যদি আমাকে দিতে চান তাহলে আমার হাত পাতা অধৈর্য প্রমান হবে। এর অর্থ এই নয় যে, তারা দোয়া করেন না বরং কোন কোন সময় উৎকর্ষ মু'মিনদের জীবনে এমন অবস্থা এসে থাকে, তারা বলেন, ঠিক আছে, আমরা হাত পাতবো না। দোয়া করার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা নিজেই দিয়েছেন, তোমরা চাও, কিন্তু অনেক সময় অনেকেই এই ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে আল্লাহ্ তা'লার সাথেও অভিমান করে, তারা বলেন, খোদা নিজেই আমাদের চাহিদা পূরণ করবেন কিন্তু এই মর্যাদা এমনি এমনিতেই লাভ হয়ে যায় না। একথা ভেবো না যে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে না, বিগলিত চিত্তে নামায পড়বে না, সদকা-খয়রাত এবং চাঁদা দেওয়ার বেলায় ঔদাসিন্য প্রদর্শন করবে, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিবে তারপরও খোদার বিশেষ কৃপাভাজন হয়ে যাবে, এটি কখনও সম্ভব নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার শুনিয়েছি, মরহুম কাজী আমীর হোসেন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি কট্টর ওহাবী ছিলেন আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যিক শ্রদ্ধাবোধ সংক্রান্ত কিছু বিষয় তার অসহ্য ছিল। অনেক ওহাবী কট্টোর হয়ে থাকে, বাহ্যিক অনেক কথা-বার্তা, বাহ্যিক আচরণের অনেক কিছুই তাদের কাছে অসহ্য লাগে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যখন হুযূর বাইরে আসতেন তখন মানুষ শ্রদ্ধাবশতঃ মসীহ্ মওউদ

(আ.)-কে দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন। কাজী সাহেব মরহুম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার ধারণা ছিল, এটি বৈধ নয় বরং এটি শির্ক আর এ সম্পর্কে সব সময় বিতর্কে লিপ্ত থাকতেন, আজকে আমাদের মাঝে যদি এমন বদভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি আমার শিক্ষকও ছিলেন। যখন আমার খিলাফতকাল আসে তখন একবার আমি বাহিরে আসলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান (অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদকে দেখতেই তিনি দাঁড়িয়ে যান)। আমি তাকে বললাম, কাজী সাহেব! এটি তো আপানার দৃষ্টিতে শির্ক, তখন তিনি হেসে উঠে বলেন, আমারও একই ধারণা কিন্তু কি করবো, থাকা যায় না, মনের অজান্তেই দাঁড়িয়ে যাই। আমি বললাম, এটিই আপনার সকল আপত্তির উত্তর। কৃত্রিমভাবে যদি কেউ দন্ডায়মান হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সেটি শির্ক কিন্তু আকুল হয়ে যদি কেউ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তা শির্ক নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথাই বলতেন, কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যাকে কৃত্রিমতা শির্কে পর্যবসিত করে, তাই একথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত। তিনি বলেন, এক ভাই-এর মৃত্যুতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিজের অজান্তেই চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন এবং নিজের মুখে হাত মারেন। কেউ জিজ্ঞাস করে, এটি কি বৈধ? তখন তিনি (রা.) বলেন, অনিয়ন্ত্রিতভাবে হয়ে গেছে, আমি পরিকল্পিতভাবে এটি করিনি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কাজী সাহেবের এই কথা সব সময় আমার মনে থাকে যে, নিজের অজ্ঞাতে, অজান্তে বা অনিয়ন্ত্রণে এটি হয়ে গেছে। এটি সাহাবীদেরই নিজস্ব রীত ছিল, আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় সবার নিজস্ব মর্যাদা ছিল ।

আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্কের ফলে কেমন নিদর্শন প্রকাশ পায় এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, একবার খুব সম্ভব হারুন উর রশীদের যুগে এক পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। খুবসম্ভব তিনি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তার নাম ছিল মুসা রেযা। তার কারণে নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে এই অজুহাতে তাকে বন্দী করা হয়। একবার মাঝ রাতে এক সিপাহী কারাগারে মুক্তির বার্তা নিয়ে তার কাছে পৌঁছে। তিনি আশ্চর্য হন, এভাবে হঠাৎ করে আমার মুক্তির নির্দেশ কীভাবে আসতে পারে? তিনি বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কী, আমাকে আপনি এভাবে হঠাৎ করে মুক্তি দিলেন? বাদশাহ্ বলেন, কারণ হলো, আমি ঘুমাচ্ছিলাম, স্বপ্নে দেখি কেউ এসে আমাকে জাগ্রত করে। স্বপ্নেই চোখ খুলে যায়, জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? জানা গেল তিনি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। আমি নিবেদন করলাম, আমার জন্য কি নির্দেশ? তিনি (সা.) বলেন, হারুন উর রশীদ! ব্যাপার কী যে, তুমি তুমি আরামে নিদ্রাযাপন করছো আর আমাদের সন্তান কারারুদ্ধ হয়ে আছে। একথা শুনে আমি এমনভাবে প্রতাপান্বিত হই যে, তখনই তোমার মুক্তির নির্দেশ দেই। সেই বুযুর্গ বলেন, সেদিন কারাগারে আমিও ব্যাকুল এবং উৎকণ্ঠিত ছিলাম, পূর্বে কখনও আমার মুক্তির বাসনা জাগেনি; কিন্তু সেদিন মুক্তির ব্যাকুল বাসনা এবং একাগ্রতা জন্মে।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পুনরায় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন প্রেমিক অর্থাৎ মুন্সি আরোড়া খান সাহেবের বরাতে বলেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেমিকদের অন্তর্গত ছিলেন। তার অভ্যাস ছিল প্রত্যেক শুক্রবার বা রবিবার তিনি কাদিয়ান আসার চেষ্টা করতেন। যখনই তিনি ছুটি পেতেন এখানে চলে আসতেন (মাসে একবারের কথাতো পূর্বেই বলা হয়েছে)। তিনি যখনই আসতেন কিছু অর্থ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে সফরের একটি অংশ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন, উদ্দেশ্য ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে তা উপহার হিসেবে পেশ করা। তার বেতন তখন খুব কমই ছিল, খুব সম্ভব ১৫/২০ রুপি আর তা দ্বারা তিনি শুধু জীবিকা নির্বাহই করতেন না বরং সফর খরচ ছাড়াও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চরনে উপহারও পেশ করতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি সব সময় তাকে একই কোটই পরতে দেখেছি, সারা জীবন দ্বিতীয় কোন কোট তাকে গায়ে দিতে দেখি নি। তিনি লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় থাকতেন আর সাধারণ একটি জামা পরিধান করতেন। তিনি ধীরে ধীরে পয়সা জমা করার প্রবল বাসনা রাখতেন আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দরবারে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ উপহার হিসাবে তা পেশ করার মনমানসিকতা রাখতেন। আন্তরিকতার কারণে ধীরে ধীরে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে উন্নতি করেন আর এক পর্যায়ে তহশীলদার পদে উন্নীত হন।

এরপর তার প্রসিদ্ধ ঘটনা যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর একদিন তিনি আসেন, আমাকে বাইরে ডাকেন আর অঝোরে ক্রন্দন আরম্ভ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারিনি, ব্যাপার কী? এরপর তিনি তিনটি বা চারটি স্বর্ণের আশরাফি বের করে দিয়ে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এগুলো দিতে চাইতাম কিন্তু তখন সেই সাধ্য ছিল না, এখন সাধ্য আছে কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর পৃথিবীতে নেই। এরপর পুনরায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই হলো প্রেম, সেই (মুন্সি সাহেবের) ঘটনার বরাতে বলেন, যদি এসব জাগতিক নিয়ামত সত্যিকার অর্থে নিয়ামত হয়ে থাকে আর সত্যিকার অর্থে যদি তা ভোগ করা সম্ভব হয়, তাহলে এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে মু'মিনের হৃদয় অবশ্যই ব্যাথা ভারাক্রান্ত হয় যে, এগুলো যদি সত্যিকার নিয়ামতই হয়ে থাকে তাহলে এই নিয়ামত লাভের সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি ঘটনা রয়েছে, যখন নরম আটার রুটি তাঁর হস্তগত হয় তখন তাঁর চোখে অশ্রু বন্যা বয়ে যায় কেননা মহানবী (সা.)-এর যুগে তা দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন তাঁরা যাঁতায় পেষা মোটা আটার রুটি খেতেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার নিজের ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, (পূর্বে বলেছেন) এই সমস্ত নিয়ামত পাওয়ার যোগ্য ছিলেন একমাত্র মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আর তাঁর পর তাঁর প্রতিচ্ছবি

এবং প্রতিচ্ছায়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এগুলো লাভের যোগ্য ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ছোট ছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আমার হৃদয়ে শিকারের আগ্রহ জন্মে। আমার কাছে একটি এয়ারগান ছিল, শিকার করে ঘরে নিয়ে আসতাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেহেতু খাবার কম খেতেন আর তাঁকে মস্তিস্কের কাজ (অর্থাৎ মাথা খাটানোর কাজ) বেশি করতে হতো তাই আমি সব সময় শিকার এনে তাঁর সামনে উপস্থাপন করতাম কেননা; আমি তাঁর কাছে বা অন্য কোন চিকিৎসকের কাছে শুনেছিলাম, যারা মস্তিস্কের কাজ করে তাদের জন্য শিকারের মাংস উপকারী হয়ে থাকে। সেই যুগে আমি কখনো নিজের জন্য শিকারের মাংস পাকিয়েছি বলে আমার মনে নেই, সব সময় শিকার করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তা দিয়ে দিতাম। কাজেই প্রেমাস্পদের প্রতি যখন মানুষের পূর্ণ ভালোবাসা থাকে, তখন সে হয়তো কোনকিছুতেই আরাম পায় না বা আরাম মনে করলেও মনে করে, এটি উপভোগ করার অধিকার প্রেমাস্পদের।

মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনী জ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বভান্ডার আমার সামনে উন্মোচিত করেছেন। আমার জীবনে বহুবার এমন হয়েছে যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোন গূঢ় রহস্য আমার সামনে উন্মোচন করা হয়েছে তখন আমার হৃদয়ে প্রবল বাসনা জাগে, যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা খলীফা আউয়াল (রা.)-এর যুগে এই গূঢ় রহস্য আমার সামনে উন্মোচিত হতো তাহলে আমি তাঁদের সামনে তা উপস্থাপন করতাম এবং তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন হতো। তিনি বলেন, আসল পদমর্যাদা বা সম্মানিত মর্যাদা তো মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই। খলীফা আউয়ালের কথা আমার মাথায় এজন্য আসলো, কারণ তিনি আমাকে কুরআন শরীফ পড়িয়েছেন আর আমার প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি চাইতেন আমি যেন কুরআনর প্রতি প্রণিধান করি এবং এর অর্থ ও গূঢ় রহস্য শিখি ও প্রকাশ করি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জাগতিক বিষয়াদি নয় বরং কোনকিছু যদি আমাদের প্রশান্তির কারণ হতে পারে তাহলে তা এই বিষয়গুলোই।

এই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেমিকের বা এমন লোকদের ঘটনা যারা কাদিয়ানে যেতেন আর সব সময় সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের বাসনা পোষণ করতেন, যেভাবে হযরত ফযল শাহ্ সাহেবের ঘটনা শুনিয়েছি। এছাড়া মুন্সি আড়োরা খান সাহেবের ঘটনাও শোনালাম। একদিকে সেসব মানুষ ছিলেন যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, কাদিয়ানে পৌঁছার চেষ্টায় রত থাকতেন। কাদিয়ান যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হতেন আর তাঁর খাতিরে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করতেন। কিন্তু কোন কোন হতভাগা এমনও হয়ে থাকে যাদের জন্য কাদিয়ানের নেক এবং পবিত্র পরিবেশ সমস্যার কারণ হয়ে যেতো। পার্থিভ আনন্দ এবং ভোগ-বিলাসিতা তাদের মাথায় এতটাই ছেয়ে থাকতো যে, এই নেক পরিবেশ থেকে তারা পালানোর চেষ্টা করতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা লিখেন।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার এক ব্যক্তি কাদিয়ান আসে এবং একদিন থাকার পর চলে যায়। যারা তাকে কাদিয়ান পাঠিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সে কাদিয়ান যাবে, সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনবে, সেখানকার অবস্থা অবলোকন করবে আর তার ওপর আহমদীয়াতের কিছু প্রভাব পড়বে। কিন্তু একদিন অবস্থান করেই সে যখন ফিরে যায় তখন যারা তাকে পাঠিয়েছিল তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, এত তড়িঘড়ি তুমি ফিরে এলে কেন? সে বললো, তওবা কর, এটি কোন ভদ্রলোকদের অবস্থানের জায়গা নয়। তারা ভেবেছিল, হয়তো কারো আচার-ব্যবহারের ভালো প্রভাব পরেনি যে কারণে সে হোঁচট খেয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি, এত তড়িঘড়ি ফিরে আসলে কেন? মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তখন কাদিয়ান এবং বাটালার মাঝে টমটম গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করত। সে বলে, আমি প্রভাতে কাদিয়ান পৌঁছি। অতিথি শালায় আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আমার আতিথেয়তা করা হয়। আমি ভাবলাম সিন্ধু থেকে এসেছি, পথিমধ্যে কোথাও হুক্কা পান করার সুযোগ হয়নি। এখন সানন্দে বসে হুক্কা পান করবো আর আরাম করবো। এরপর হুক্কার অপেক্ষায় ছিলাম, একজন এসে বললো, বড় মৌলভী সাহেব অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এখন হাদীসের দরস দিতে যাচ্ছেন, প্রথমে দরস শুনুন তারপর হুক্কা পান করা যাবে। আমি বললাম, চল, কাদিয়ান এসেছি যখন হাদীসের দরস শুনে আসি। হাদীসের দরস শুনে আসার পর এক ব্যক্তি বলে, খাবার প্রস্তুত, প্রথমে খাবার খান, আমি বললাম, ঠিক আছে খাবার শেষে আরাম করে হুক্কা পান করবো। খাবার খেয়ে মাত্র বসেছি, কেউ বলে, যোহরের আযান হয়ে গেছে, আমি ভাবলাম, কাদিয়ান যখন আসলামই চল নামাযও পড়ে নেই। যোহরের নামায শেষ করলাম, এরপর মির্যা সাহেব মসজিদে বসে পড়েন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসে পড়েন আর কথা আরম্ভ হয়ে যায়। আমি বললাম, চল মির্যা সাহেবের কথাবার্তাও শুনে নেই যে, তিনি কি বলেন, এরপর গিয়ে হুক্কা পান করবো। হুক্কার কথা তখনও মাথা থেকে বের হয়নি। সেখান থেকে কথা শুনে আসলাম, প্রস্রাব-পায়খানা শেষে আরামের সাথে হুক্কা জ্বালালাম, এখন সব কাজ শেষ হলো, এখন আরাম করে হুক্কা পান করবো। দু'বার হুক্কায় টান দিতেই কেউ বললো, আসরের আযান হয়ে গেছে, নামায পড়ে আস। তখন হুক্কা সেভাবেই রেখে আসরের নামাযের জন্য চলে গেলাম। আসর নামায পড়ার পর ভাবলাম, এখন সন্ধ্যা পর্যন্ত হুক্কার জন্য হয়তো অবসর পাবো। কেউ বললো, বড় মৌলভী সাহেব মসজিদে আক্বসায় গিয়েছেন, সেখানে কুরআনের দরস হবে। আমি ভেবেছিলাম, সন্ধ্যা র্যন্ত হুক্কা পান করার সুযোগ হবে, যাহোক মনে মনে বললাম, আসলাম যখন তখন কুরআনের দরসও শুনে নেই। বড় মসজিদে গেলাম, দরস শুনলাম, শুনে ফিরে এলাম। এরই মাঝে মাগরিবের আযান হয়ে যায়, হুক্কা সেভাবেই পড়ে ছিল। এরপর মাগরিবের নামাযের জন্য চলে যাই। নামায শেষে পুনরায় মির্যা সাহেব বসে যান, আর বাধ্য হয়ে আমরাও বসে পড়লাম, ভাবলাম চল মির্যা সাহেবের কথা শুনে নেই। অবশেষে সেখান থেকে ফিরে এলাম, ভাবলাম, এবার হয়তো হুক্কা পান করার সুযোগ হবে। কিন্তু খাবার এসে যায় আর বলে, খাবার খেয়ে নাও

তারপর হুক্কা পান করো। রাতের খাবারও খেলাম। ভাবলাম, এবার আরাম করে হুক্কা নিয়ে বসবো। এরপর এশার আযান হয়ে যায়, মানুষ বলে, ইশার নামায পড়ে নাও। যাহোক ইশার নামাযের জন্য চলে গেলাম, নামায পড়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম, এখন তো আর কোন কাজ বাকী নেই, এখন হুক্কা পান করার পুরো অবসর রয়েছে। কিন্তু হুক্কা জ্বালাতেই জানতে পারলাম, বাহির থেকে আগত অতিথিদের ইশার নামাযের পর বড় মৌলভী সাহেব কিছু ওয়ায নসীহত করে থাকেন। এরপর বড় মৌলভী সাহেব ওয়ায নসীহত আরম্ভ করেন, তিনি ওয়ায-নসীহত করছিলেন কিন্তু সফরের ক্লান্তি ও শ্রান্তির কারণে বসা অবস্থায়ই আমার ঘুম পায়। এরপর আমি জানতেই পারিনি, আমি কোথায় আর আমার হুক্কা কোথায়। সকালে উঠতেই বিছানা উঠিয়ে সেখান থেকে পালালাম যে, কাদিয়ানে ভদ্র মানুষের থাকার যায়গা নয়।

অতএব এই হলো ভদ্র লোকদের অবস্থা আর এ কারণেই, অর্থাৎ যহেতু নেশায় অভ্যস্ত ছিল তাই ধর্মীয় জ্ঞান শেখা থেকে বঞ্চিত থাকে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্য থেকেও বঞ্চিত থাকে। নেশাখোরদের জন্য এতে শিক্ষণীয় দিক রয়েছে।

এখন পৃথিবীর বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। পৃথিবী যে ধ্বংসের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এর জন্য বন্ধুদের অনেক বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। নাম সর্বস্ব ইসলামী রাজত্ব যা ইরাক এবং সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত, এর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র ফ্রান্সের হৃদয় বিদারক ঘটনার পর যে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর বিমান হামলার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বরং হামলা আরম্ভ করেছে, যদি এসব সরকারের আক্রমণ করতেই হয় তাদের ওপর করা উচিত, যারা যুলুম করছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব আক্রমন থেকে নিরীহ লোকদের এবং জনসাধারণকে রক্ষা করুন।

স্থানীয় অধিবাসীরা অর্থাৎ সিরিয়া ইত্যাদি দেশে অধিকাংশ মানুষ চাক্কি বা ঘানিতে পিষ্ট হচ্ছে, কোন দিকে তাদের জন্য রাস্তা খোলা নেই। প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলোও এই নৈরাজ্যের অবসানের ব্যাপারে আন্তরিক নয়। তাদের অর্থাৎ প্রতিবেশী দেশগুলোর উচিত ছিল সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের সাহায্য করে এই নৈরাজ্যের অবসান করা কিন্তু একে বৃদ্ধি পেতে দেয়া হয়েছে আর এই নৈরাজ্য এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এখনও বলা হয়, কতিপয় প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্র এই নামসর্বস্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসায় রত, তাদের তেল ইত্যাদি ক্রয় করছে। রাশিয়া তুরস্ককে এর জন্য অভিযুক্ত করছে। যদিও তুরস্ক এটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পাল্টা অভিযোগ আরোপ করছে। যাহোক, কিছু না কিছু তো হচ্ছে, ব্যবসা যে চলছে একথা আমি বেশ কয়েক বছর ধরে বলে আসছি। এসব বিমান হামলায় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের সাথে রাশিয়াও যুক্ত রয়েছে। যদিও পাশ্চাত্যের সাথে রাশিয়ার মতবিরোধ রয়েছে। রাশিয়া সিরিয়ার সরকারের অর্থাৎ বাশার আল্ আসাদের সরকারের পক্ষ নিচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এর বিরোধী কিন্তু এখন দায়েস বা আইসিস উভয়ের সম্মিলিত টার্গেট বা লক্ষ্য কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যেমনটি বলেছি, তাদের মাঝে মতভেদ বা মতবিরোধ রয়েছে।

ভয়াবহ অবস্থায় চীন রাশিয়াকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করে। এদিকে সিরিয়ার সরকার বলে, ইউরোপের বিমান হামলা ততক্ষণ ফল বয়ে আনবে না যতক্ষণ আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে তা না করবে। এরপর রাশিয়ার যে জাহাজ তুরস্ক ভূপাতিত করেছে এরফলে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ এবং শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একথাও শুনেছি যে, নামসর্বস্ব ইসলামী রাষ্ট্র আর একটি নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যে, যদি ইরাক এবং সিরিয়া ছাড়তে হয় তাহলে লিবিয়াতে আমরা ঘাঁটি স্থাপন করবো, সেখানেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবো। এর ফলাফল কি প্রকাশ পাবে? এটি স্পষ্ট যে, এটিকে এরা নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে, এরপর বিমান হামলা হয়তো লিবিয়াতেই আরম্ভ হতে পারে। সেখানেও সাধারণ মানুষ মরবে। পাশ্চাত্য প্রথমে এসব সরকারকে সাহায্য দিয়ে থাকে এরপর তাদের বিরুদ্ধেই দন্ডায়মান হয়। লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি রাষ্ট্রে সরকারের বিরুদ্ধে তারা দন্ডায়মান হয়ে সরকারের পতন ঘটিয়েছে, বা পতন ঘটানোর চেষ্টা করছে আর এসব কিছু দীর্ঘকাল অন্যায়ের কারণে হয়েছে অর্থাৎ এর ফলেই পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়িয়ে আছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান দেশের বিভিন্ন সরকার স্ব-স্ব দেশে অন্যায় এবং অবিচার করছে। এক কথায় পরিস্থিতি এমন জটিল রূপ ধারণ করেছে, বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বরং ছোট পরিসরে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভও হয়ে গেছে। এখানকার অনেক বিশ্লেষকই এখন একথা স্বীকার করছেন এবং লিখছেনও, বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এ কথার দিকে গত কয়েক বছর ধরে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যদিও এখন এরা নিজেরাও এমন কথা বলা আরম্ভ করেছে। কিন্তু এখনও এটিই মনে হচ্ছে যে, ন্যায়ের ভিত্তিতে কার্যসাধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে না। পরাশক্তিও আর মুসলমান রাষ্ট্রগুলোরও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হবে না। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে, নামধারী ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবাই সম্মিলিত ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাই একে যদি নির্মূল করা হয় বা করতে পারে তাহলে শান্তি ফিরে আসবে, কিন্তু কিছু কিছু পরিস্থিতি এদিকেও ইঙ্গিত করছে যে, এই নৈরাজ্যের সমাপ্তি ঘটলেও পরিস্থিতি কিন্তু স্বাভাবিক হবে না বরং এরপর পরাশক্তিগুলোর নিজেদের মাঝে টানাপোড়েন আরম্ভ হবে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াও অসম্ভব নয়। কেননা রাশিয়া এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের মাঝে মনোমালিন্য বেড়েই চলেছে আর এর ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষই মারা যাবে। বিগত বিশ্বযুদ্ধগুলোতে আমরা এটিই দেখেছি, সাধারণ মানুষ এবং নিরীহ মানুষই মারা যায়, তাই অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। এছাড়া সাবধানতামূলক পদক্ষেপের প্রতি বিগত বছরগুলোতেও আমি জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, আপনারাও এদিকে দৃষ্টি দিন। সংক্ষেপে কিছু কথার প্রতি আমি ইঙ্গিত করেছি, পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করছি, দোয়ার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার এবং জনসাধারণকে সুবুদ্ধি দিন, যাতে তারা পৃথিবীকে ধ্বংসের পানে নিয়ে না যায়।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।